প্রথম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব(খৃ-১৪৮৬-১৫৩৩) বাঙালা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়ে বাঙালী জাতি অখন্ড রূপ গ্রহণ করল। বাঙালীর জনজীবনে এল নব জাগরণ। অধ্যাত্মচর্চায় আর সাহিত্যের অনুশীলনে এই জাগরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় সঙ্গীতে অর্থাৎ কীর্তন গানের বিকাশে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালা সাহিত্যের উন্মেষ পরিপূর্ণ হলো। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবিরা প্রায় সকলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রধান তাঁরা প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য-অনুশিষ্য ছিলেন।

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা অর্থাৎ সাধারণ লোকের সাহিত্যিক রুচি কেমন ছিল সে বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এবং জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে যা বলা হয়েছে তা বিশেষ মূল্যবান্। রামায়ণ-কাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী, ও বিষহরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-কাহিনী নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হতো। সেকালে রামলীলা কিভাবে অভিনীত হতো তার কিছু আভাস পাওয়া যায় চৈতন্য-ভাগবতে। কালিদমন গীত এবং দুর্গা ও লক্ষ্মীর গীত প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে আনন্দের যোগান দিত। বৃন্দাবন দাস আরও বলেছেন যে, তখনকার দিনে লোকে পাল-রাজগণের কীর্তিগাথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করত। এতদিন বাঙালীর সাহিত্য ছিল ব্রতকথা উপকথা নিয়ে, বড় জোর রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা অবলম্বন করে,। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র বাঙালীর মনপ্রাণ অভিভূত করে দিল। ছেলে ভুলান ছড়া ও উপকথার মোহ ত্যাগ করে বাঙালী কবির লেখনী সমসাময়িক মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে মেতে উঠল। কেবল বাংলা সাহিত্য নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালী গৃহকোণ পরিত্যাগ করে সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হ'ল।

সর্বভারত পর্যটন করে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরেক পর্যটক শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন - "The influence of Sri Chaitanya is all over India. Wherever the Bhakti-Margo is known, there he is appreciated, studied, and worshipped. ... most of his so-called disciples in Bengal do not know how his power is still working all over India".[১]

অর্থাৎ - " শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সারা ভারত জুড়ে। যেখানেই আছে ভক্তি-মার্গ, সেখানেই তাঁর অর্চনা, চর্চা ও উপলব্ধি। ... বঙ্গদেশে তাঁর তথাকথিত শিষ্যদের অধিকাংশই জানেন না, সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব আজও কিভাবে কাজ করে চলেছে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সম্বর্ধনার উত্তরে স্বামীজী একথা বলার পর গঙ্গা-গোদাবরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়েছে একথা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ মাত্র একটি - ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'। ডঃ মজুমদার মহাশয় তাঁর এই দিগ্‌দর্শিনী গ্রন্থে আসাম, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মুলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্য প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ সম্বন্ধে এবং সে যুগের বাংলাদেশের আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা, সাহিত্য ও ধর্মমত প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা

প্রয়োজন। ১২০১ খ্রী· মহম্মদ বক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করলে রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন অনুমান ১২০৭ খ্রীঃ এবং বিক্রমপুরে মারা যান। তারপর বাংলাদেশে কোথাও কোথাও কখনও কখনও কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু রাজার অভ্যুদয় হলেও সমগ্র দেশ ক্রমে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়।

লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল গৌড়ের মালদহ জেলার কাছে, একে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লখনাওয়াতি (লক্ষণাবতী ?) বলতেন। সে যুগে ভাগীরথীর পশ্চিমের দেশকে রাঢ়, উত্তরের দেশকে বরেন্দ্র (বারেন্দ্র, বরেন্দ্রী) এবং পূর্বের দেশকে গৌড় বলা হত। বঙ্গদেশ বলতে পদ্মাপারের পূর্ববাংলা বুঝাত। আধুনিক পশ্চিমবাংলাকে এবং কখনও হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেই ১৫-১৬ শতকে পঞ্চগৌড় বলা হত।[২]

নবদ্বীপ লক্ষ্মণসেনের কখনও রাজধানী ছিল না, সাময়িক বাসস্থান মাত্র ছিল। ভাগীরথীর পবিত্র স্থান বলে শুধু নয়, বোধহয় স্বাস্থ্যকর স্থানরূপেও নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল এবং ইহা বাংলাদেশের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। আজকাল নবদ্বীপ ও কাটোয়া ভাগীরথীর একই তটে কিন্তু সে যুগের বর্ণনায় দেখা যায় নবদ্বীপ হতে কাটোয়া যেতে হলে নদী পার হতে হত। এতে বুঝা যায় চৈতন্য-পরবর্তী যুগে কোনও সময়ে কোনরূপ প্রাকৃতিক কারণে নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে ভাগীরথী এখন নবদ্বীপের পূর্ব ও উত্তরে প্রবাহিত। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের জলঙ্গী বা খড়ে নদী পদ্মা থেকে বাহির হয়ে নবদ্বীপের নিকটে ভাগীরথীতে পড়েছে। এই জলপথে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলের বাণিজ্যাদি চলত। লক্ষণ সেন সম্ভবত এই পথেই পূর্ববঙ্গে পালিয়ে ছিলেন। জলঙ্গী সে যুগে খরস্রোতা ছিল। ভাগীরথী বাণিজ্যাদি যাতায়াতের প্রধান পথ ছিল বলে পালবংশীয় রাজাদের সময় থেকে রাজকীয় নৌবাহিনী এই জলপথ পাহারা দিত।

দক্ষিণভারত ও ভারতবহির্ভূত দেশের সঙ্গে সমুদ্র ও ভাগীরথী পথে উত্তরভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্য চলত। সে যুগের বাংলা সাহিত্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ে বাঙালীদের সমুদ্রযাত্রার অনেক উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে নবদ্বীপের শঙ্খ বণিক তাম্বুলি তন্তুবায় প্রভৃতি পাড়ার উল্লেখ হতে বুঝা যায় নবদ্বীপে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে নানা বাণিজ্যসম্ভার একত্র হত। নবদ্বীপ অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল আম্বুয়া (অম্বুয়া, বা কালনা, আধুনিক অম্বিকা কালনা)।

পশ্চিমবাংলার সামুদ্রিক নৌবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও। এ স্থান সরস্বতী ও হুগলি নদী এবং পূর্বদিক হতে প্রবাহিত যমুনার মিলনস্থান ত্রিবেণীর নিকটে।[২] হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের অনতিদূরে সরস্বতীতটে অবস্থিত ছিল। সে যুগে সরস্বতী খরস্রোতা ছিল। বাণিজ্যের কারণে নবদ্বীপ হতে বহু সমৃদ্ধ ছিল সপ্তগ্রাম। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্য[৩] ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে[৪] সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ব্যবসায়, নানা জাতীয় লোকের বসতি এবং ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। ১৪ শতকে মুহম্মদ বিন তুঘলক বাংলাদেশ শাসনে সাতগাঁওতে একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন এবং ইবন বতুতা সমুদ্রপথে আফ্রিকা থেকে চীনদেশে যাবার সময় হুগলি নদী পথে সাতগাঁওর বৃহৎ বন্দরে এসে সে স্থান হতে সিলেট গিয়েছিলেন।[৫] ১৬ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজরা মালাবার ও চট্টগ্রাম থেকে অবশেষে হুগলি নদীতে প্রবেশ করে শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিন মাহমুদের অনুমতিক্রমে সাতগাঁওতে গুদাম ও কারখানা স্থাপন করে। তাদের পণ্যে বোঝাই ৩০-৩৫ খানা ছোটবড় সমুদ্রপোত সাতগাঁওতে যাতায়াত করত। সাতগাঁও এবং হুগলি নদীর 'বন্দর' (আরবি শব্দ) হতে পর্তুগীজে 'বন্দেল' এবং তা ইংরাজীতে 'ব্যান্ডেল' নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে সরস্বতীর মুখ চড়ায়

বন্ধ হয়ে গেলে পর্তুগীজরা হুগলিতে বন্দর স্থাপন করে। ১৬ শতকের শেষদিকে হুগলিতে বড় বড় বন্দর গড়ে উঠলেও সাতগাঁয়ের সমৃদ্ধি কমে নাই। কালক্রমে সরস্বতী মরা খালে ও জঙ্গলে পরিণত হয়। হুগলীর পর ফরাসিদের চন্দননগরে এবং তারপর ইংরেজদের কলকাতায় কিভাবে হুগলি নদী পথে ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা ইতিহাসে সুবিদিত। পূর্ব-ভারতের বহির্বাণিজ্যে বর্তমানে কলকাতার যে স্থান, মধ্যযুগে বাংলাদেশে সে স্থানের অধিকারী ছিল সপ্তগ্রাম।

ফরাসী আমলে যেমন হুগলি ও চন্দননগরে এবং ইংরেজ আমলে যেমন কলকাতায় হয়েছিল, তেমনি সে যুগে গঙ্গাতীরবর্তী পবিত্রস্থান ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র বলে বাংলাদেশের নানাস্থান হতে বহুলোক সপ্তগ্রাম ওনবদ্বীপে এসে বসতি করে। শ্রীহট্ট বা সিলেট এবং চট্টগ্রাম বা চাটিগা হতে আগতদের মধ্যে অনেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়েছিলেন। পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক দুর্যোগও অনেকের দেশত্যাগ করে গৌড় আগমনের কারণ হয়ে থাকতে পারে। লক্ষ্মণ সেনের যুগে নবদ্বীপে ছিল ভাগীরথীর তীরে মাটি বাঁশ খড়ের বাড়ীর শ্রেণী। কালক্রমে নবদ্বীপের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সুলতান হুসেন শাহ্ :

বিভিন্ন মুসলমান বংশের আধিপত্যের পর ১৫ শতকের মধ্যভাগে রুকনুদ্দিন বরবক এবং ঐ শতকের শেষে আলাউদ্দিন হুসেন বাংলার শাসনকর্তা হন। হুসেন সমগ্র বাংলাদেশ, উত্তর বিহার ও আসামে রাজ্য বিস্তার করে শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ১৫১৯ খ্রী: পর্য্যন্ত এবং তাঁর বংশধররা ১৫৩৮ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর শের শাহ বাংলার অধীশ্বর হলে পাঠান বা আফগানরা ১৫৭৫ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করবার পর বাংলাদেশ ক্রমে মুঘলদের অধীনে আসে।

আকবর ছাড়া আর কোনও মুসলমান রাজার শাসনে বাংলাদেশ হুসেনের রাজত্বকালের মত সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করে নাই। হুসেন হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করে সুযোগ্য হিন্দুদের উচ্চতম রাজকর্মে নিয়োগ করেন, ক্রমে আমরা শ্রীচৈতন্যজীবনকথা সম্পর্কে এঁদের অনেকের পরিচয় পাব।

ধর্মবিষয়ে উদারতার সঙ্গে হুসেন বাংলা সাহিত্যের প্রসারেও বিশেষ উৎসাহ দান করেন। সে যুগে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালি গান ছিল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ, কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই সাধারণত সংস্কৃতেরই চর্চা করতেন। সমসাময়িক বাঙালী গ্রন্থকারেরা অনেকে হুসেনের নাম ও সুখ্যাতি করেছেন, যেমন মনসামঙ্গল-রচয়িতা বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি। হুসেনের চাটি গাঁ অঞ্চলের শাসনকর্তা পরাগলের আদেশে 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর মহাভারতের যে বাংলা অনুবাদ করেন তা 'পরাগলি মহাভারত' নামে খ্যাত হয় - পরমেশ্বর হুসেন সম্বন্ধে বলেছেন "কলিযুগে এই ভেল কৃষ্ণ অবতার"। পরাগলের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর মহাভারত - অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করেন। বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম (হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জৌগ্রাম বা গুড়াপ অথবা মেন লাইনের মেমারি ষ্টেশন থেকে যেতে হয়) নিবাসী মালাধর বসুকে হুসেন বাংলায় ভাগবত অনুবাদের ভার দিয়েছিলেন। মালাধর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচনা করে হুসেনের (অথবা তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা রুকনুদ্দিন বরবকের) কাছে 'গুণরাজ খান' উপাধিলাভ করেন।[৬]

বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা -

উড়িষ্যাকে সে যুগে ওড্র বা উৎকল বা কলিঙ্গ দেশ বলা হত। জীবনের শেষার্ধ শ্রীচৈতন্য পুরীতে বসবাস করায় সে যুগে বাংলা-উড়িষ্যা সম্পর্ক বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন।

সে যুগে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমভাগ অর্থাৎ মোটামুটি এখনকার মেদিনীপুর জেলা প্রায়ই উড়িষ্যার শাসনাধীন থাকত। হুগলি জেলার অন্তর্গত আরাম-বাগের ৮ মাইল পশ্চিমে গড় মন্দারণ দুর্গ বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তে রাজপথের উপর অবস্থিত ছিল - এই কারণে এই দুর্গ নিয়ে উভয়পক্ষে প্রায়ই যুদ্ধ হত।

৭ শতকে চীনা শ্রমণ হিউয়েন চাং যখন উড়িষ্যা পর্যটন করেন তখন তিনি উত্তর উড়িষ্যার রাজধানীর অবস্থান বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হয় যাজপুর তখন উত্তর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। ১৩ শতকের পর থেকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা সমগ্র উত্তর ও মধ্য উড়িষ্যাকে যাজনগর নামে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যাজ-পুরের অধিপতি রাজবংশ সে যুগে অতি প্রতাপশালী ছিলেন। ১৩ শতকের প্রারম্ভে বাংলার মুসলমান অধিপতিদের সঙ্গে উড়িষ্যার বহু যুদ্ধ হয় এবং উড়িষ্যারাজ ৩য় অনঙ্গ ভীমের সেনাপতি যাজপুরাধিপতি বিষ্ণু রাঢ়দেশ আক্রমণ করেন। গৌড়ের মুসলমান রাজারা উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, কারণ তখন উড়িষ্যা রাজারাই গৌড়ের মুসলমান রাজাদের প্রধান শত্রু ছিলেন। ৩য় অনঙ্গভীমের পুত্র ১ম নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রী আক্রমণ করে ভাগীরথী পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। বাংলার মুসলমানরা উড়িষ্যার কোনও অংশ স্থায়ীভাবে জয় করতে না পারলেও প্রায়ই আক্রমণ ও লুটতরাজ করতেন। ১৪ শতকের মধ্যভাগে বাংলার শাসনকর্তা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ একবার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত দেশ লুট করেছিলেন। বাংলার মুসলমানদের বারবার উড়িষ্যা আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু দেশ জয় ছিল না, ধর্ম-বিরোধ, মন্দির ও প্রতিমাদি ভাঙা, মন্দিরের ধনরত্ন লুটের লোভও এর কারণ ছিল। ফলে উড়িষ্যার রাজারাও সুবিধা পেলেই বাংলার মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করতেন।

১৫ শতকে উড়িষ্যার গজপতি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কপিলেন্দ্রদেবের একটি লিপিতে তিনি নিজেকে গৌড়েশ্বর বলেছেন এবং গৌড়ের মুসলমান অধিপতিকে পরাজয় করার কথা জানিয়েছেন। এ যুগের আরও একটি উড়িষ্যা লিপিতে বাংলার যে দুজন 'তুরুষ্ক'

রাজাকে জয়ের উল্লেখ আছে তার একজন সম্ভবত ছিলেন নাসিরুদ্দিন বা ১ম মাহমুদ। এ বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় রাজাদের লিপির সকল কথা সর্বদা গ্রহণীয় নয়, কারণ ইতিহাসের আলোকে দেখা গেছে, রাজপ্রশস্তি করে লেখকরা শুধু সাময়িক জয় নয়, বহুক্ষেত্রে সন্ধিস্থাপনের পরও, এমনকি পরাজিত হলেও বা আদৌ যুদ্ধ না ঘটলেও নিজ রাজাকে বিজয়ী রূপে বর্ণনা করতেন।

কপিলেন্দ্রদেবের সঙ্গে রুকনুদ্দিন বরবকের গড় মন্দারণ নিয়ে পুনঃপুনঃ যুদ্ধ হয় এবং কপিলেন্দ্রের রাজ্য গড় মন্দারণ হতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কপিলেন্দ্রের পুত্র পুরুষোত্তমদেবও অতি পরাক্রমশালী ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালেও উড়িষ্যা-রাজ্যের উত্তরসীমা কপিলেন্দ্র-যুগের মতোই ছিল। ১৫ শতকের শেষে পুরুষোত্তমের পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে অধিরোহন করা মাত্র হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে বিতাড়িত হন কিন্তু ১৬ শতকের আরম্ভে প্রতাপরুদ্রকে বার বার হুসেন শাহের সেনার সঙ্গে লড়তে হয় - সাময়িকভাবে যে পক্ষ যখন কিছু সফলকাম হতেন তিনিই তখন নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করতেন। এই সময়ে মুসলমানরা একবার পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ মন্দির লুট করেছিলেন এবং মন্দির ও প্রতিমাদি ভেঙ্গে ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্য দীর্ঘকাল পুরীবাস করেছিলেন। উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব অনুমান ১৫৬৬ খ্রী: বাংলাদেশ আক্রমণ ও সপ্তগ্রাম পর্যন্ত অধিকার করে ত্রিবেণীর কাছে হুগলী নদীতীরে একটি ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। ১৫৬৬-৬৭ খ্রী: বাংলার রাজা সুলেমান কররানির পুত্র বয়াজিত ছোটনাগপুর ও ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যা আক্রমণ করলে সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার বিদ্রোহী দলের হস্তে মুকুন্দদেবের প্রাণনাশ হয় এবং মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় পুরী ও চিলকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বহু মন্দির ও প্রতিমাদি ধ্বংস করেন। এরপর উড়িষ্যা পাঠানদের শাসনাধীন হয়। উত্তরকালে পাঠান ও মুঘলে

উড়িষ্যার যে যুদ্ধবিগ্রহ হয় তার সঙ্গে বাংলার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। মুঘলযুগের প্রারম্ভে দেখা যায় সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত হিসাবে গণ্য করা হত। ১৭০৬ খ্রী: মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে মেদিনীপুর জেলা স্থায়ীভাবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলার মুসলমান ও উড়িষ্যার রাজাদের বহু যুদ্ধাদি সম্পর্কে মনে রাখা আবশ্যক যে, বেতনভুক্ সেনা ও কর্মচারীবর্গ ছাড়া বাংলার হিন্দু জনসাধারণের এতে কোন যোগ ছিল না, যদিও এটা সত্য যে জাতীয় দুর্বলতা বশত ও রাজনৈতিক সংহতিবোধের অভাবে হিন্দুর একতাবোধ না থাকায় বাঙালী হিন্দুরা উড়িষ্যাকেও কোনরূপ সহায়তা করে নাই। কিন্তু তথাপি যুদ্ধবিগ্রহাদি কালে মানুষের যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বাধা অবশ্যম্ভাবী তার অতিরিক্ত আর কোন বাধাই বাঙালী ও উড়িষ্যার হিন্দুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটায়নি।[৭]

আসামে শ্রীচৈতন্য :

আসামের জনশ্রুতিতে ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ, ভাগবত প্রচার, শঙ্কর দেব ও শঙ্কর-শিষ্য দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩২২ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় 'আসামে শ্রী চৈতন্য' নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য এই প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :

" ... এই দেশের বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা, দামোদরী, মহাপুরুষিয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা এই দেশবাসী লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্যপন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন তাহা অনুসন্ধান

করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহ-কুণ্ডের অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে 'চৈতন্য ঘোপা' বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লখনুরাম চৌধুরী মহাশয় 'সৎ সম্প্রদায় কথা' নামক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পরশু-রাম কুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। (সৎ সম্প্রদায় কথা, পৃ.৩০)

ড: নির্মল নারায়ণ গুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' (পৃ.৬৯) নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়েই দাস্য ভক্তির কথা বলেছেন।

... শংকরদেবের ধর্ম প্রচার শুরু হবার আগেই শ্রীচৈতন্য আসামের মাটিতে ভক্তিবীজ বপন করেছিলেন, মাধব, দামোদর ও শংকরদেবকে তিনিই ভক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন, এবং আসামের শংকরদেব, তাঁর সম্প্রদায় এবং আসামের বৈষ্ণবধর্ম নি সন্দেহে চৈতন্য প্রভাবিত।[৮]

সমকালীন সাহিত্য :

শ্রীচৈতন্যভক্তদের রচিত সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে এখানে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

বর্ধমান-কুলীনগ্রামের মালাধর বসু (গুণরাজ খান) কর্তৃক ১৫ শতকের শেষভাগে রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় (বা গোবিন্দবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল) এই যুগের প্রথম গ্রন্থ।[৯] ১৫-১৬ শতকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি রচিত হয়। পদ্যে রচিত সকল বিষয়ের মত ইহাও গান করা হত। নানা স্থানের বিভিন্ন যুগের গায়ন (অর্থাৎ গায়ক) ও লিপিকরদের দ্বারা ক্রমে কৃত্তিবাসের রচনায় নানা রূপ পরিবর্তন হয়।[১০]

বিদ্যাপতি - নামধারী গীতরচয়িতারা নামে বিভিন্ন লোক ছিলেন।[১১] বৈষ্ণব পদাবলী গান ১৫-১৬ শতকে রাজসভা ও ধনীদের বৈঠক থেকে ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মজলিসে প্রচলিত হয়। চণ্ডীদাস - নামে বিভিন্ন গীতরচয়িতাদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা, অনুমান ১৬ শতকের মধ্যভাগের বড়ু চণ্ডীদাস।[১২] বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয় নামেই কয়েকজন ব্যক্তি সংস্কৃতেও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। ১৫-১৭ শতকে মনসাচণ্ডী ধর্ম প্রভৃতির মহিমাবর্ণক মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত হয় - যে কাহিনী শুনলে মঙ্গল লাভ হয় তাকে 'মঙ্গল' বলা হত। সর্বপ্রথম মনসামঙ্গল রচয়িতা ছিলেন বিপ্রদাস।[১৩]

হুসেন শাহের রাজত্বকালের প্রধান রচনাগুলির নাম পূর্বে বলা হয়েছে। রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব নামক কাব্যটি অনুমান ১৫৩৩ খ্রীঃ রচিত।[১৪] দ্বিজ রঘুনাথ অনুমান ১৫৬৭ খ্রীঃ অশ্বমেধ-পাঁচালি রচনা করে উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সভায় পাঠ করেছিলেন।[১৫] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল আকবরের রাজত্বকালের রচনা।[১৬]

সংস্কৃত পণ্ডিতদের রচনা

১৫-১৬ শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার প্রধানকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল নবদ্বীপে। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা প্রধানত তন্ত্র স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ ও টীকাদি রচনা করেছিলেন। বেদ উপনিষৎ দর্শন প্রভৃতিতে বাঙালী পণ্ডিতেরা তেমন বিশেষ কিছু রচনা করেন নাই। ফরিদপুর জেলার মধুসূদন সরস্বতী সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের কিছু পরবর্তী কালের লোক ছিলেন, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা হলেও ইনি ব্রজের কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন।

তান্ত্রিক কৃষ্ণনাথ আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন। শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি বিখ্যাত স্মার্ত ছিলেন। ততোধিক বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন শ্রীনাথের শিষ্য ছিলেন। রঘুনন্দন তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর রচনাবলীতে নানা তন্ত্রশাস্ত্র উল্লিখিত ও তাঁর উপদিষ্ট বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানাদিতে তান্ত্রিক মতানুযায়ী বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। রঘুনন্দন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সমসাময়িক ছিলেন।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাঙালী হলেও আজীবন কাশীবাসী ছিলেন। তাঁর কাল অজ্ঞাত, তবে ১২ হতে ১৫ শতকের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়।

অনুমান ১৬ শতকের মধ্যভাগে বহু স্মৃতিগ্রন্থ রচয়িতা গোবিন্দানন্দ মেদিনীপুরবাসী ছিলেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের শ্রেষ্ঠ খ্যাতি নব্যন্যায় চর্চায়। বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের বাল্যকালে নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীবাসী হয়েছিলেন। পুরীবাস কালে শ্রীচৈতন্যের সংগে বাসুদেবের পরিচয় হয়। শ্রীচৈতন্যের পুরীজীবন ও বাসুদেব সম্বন্ধে

অনেক কথা আমাদের এই গ্রন্থে আলোচিত হবে। শ্রীচৈতন্যের পুরীবাস কালেই সার্বভৌম পুরী ছেড়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপে থাকা কালেই খ্যাতনামা নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর ছাত্র ছিলেন।

১৬ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ঐ শতকের প্রথমার্ধের কৃষ্ণদাস সার্বভৌম নবদ্বীপের লোক নাও হতে পারেন, এবং শেষার্ধের ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্বভৌম, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ, এই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকরা সকলেই নবদ্বীপবাসী ছিলেন। ১৭ শতকের প্রথমার্ধেও নবদ্বীপে কয়েকজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িকের উদয় হয়। লক্ষণ সেনের সভাকবি ও পবনদূত কাব্য - রচয়িতা ধোয়ী এবং গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবের পর বাংলাদেশে সংস্কৃতে কাব্য - নাটকাদি রচনায় রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এ তিনজন শ্রী চৈতন্যভক্ত ছাড়া আর কেউই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই।[১৭]

বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাব :

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিন ফতে শাহের রাজত্বকালে। কিন্তু তাঁর কর্ম ও সাধনার সময়ে বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই মুসলমান শাসকের সৈন্যদল এবং পীর ফকির গাজীদের উপদ্রবে হিন্দুসমাজ উৎসন্নে যাবার উপক্রম হয়েছিল, শাসককুল পরাজিত

হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করে কখনও বা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন। হিন্দুদের প্রাণত্যাগ ও ধর্মত্যাগের মধ্যে একটি বেছে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হিন্দুকে স্বধর্মে আনয়ন করা ছিল মুসলমানদের পবিত্র কর্ম। হোসেন শাহের পূর্ব পর্যন্ত একই রীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ধর্মান্তরীকরণ, হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করা এবং মন্দির, সঙ্ঘারামের ভগ্নাংশ দিয়ে মসজিদ নির্মান করাও সমানভাবে চলেছে।

সিকান্দার শাহ (১৩৫৭ - ৮৯ খ্রী:) বহু মন্দির সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়ে তদ্দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ইউসুফ্ শাহের আমলে পান্ডুয়ার সূর্যমন্দির ও নারায়ণ মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল।[১৮]

আর একজন সুপন্ডিতের মন্তব্য : " দেশ আতঙ্কপূর্ণ এবং খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত। তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে। রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি পন্ডিত এখন অনাথ, সমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহারগুলিও বিধ্বস্ত।"[১৯]

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় আদিনা মসজিদ সম্পর্কে লিখেছেন, "মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মসজিদ তৈরি হত, তাতে সাধারণত: দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হত। অথবা উল্টে রাখা হত, কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যে সব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজাসুজিভাবে বসানো আছে। তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভেতরে বেশ ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দর ভাবে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে, ঐ প্যানেল-গুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত। কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।"[২০]

অনেক পীর ফকির নিম্নবর্ণের হিন্দুকে উদার শ্রেণীহীন ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে আসার জন্য প্রলুব্ধ করছিলেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড: কে.আর. কানুনগো তাঁর "Islam and its impact on India" গ্রন্থে লিখেছেন -

"In Bengal, the suppressed and unorthodox lower classes nursed a grievance against the Brahmanas, ... But it is a fact that a large number of untouchables and socially repressed people of Bengal accepted Islam partly lured by prospect of bettering their social and economic status, and partly attracted by the magnetic personality and sincere piety of some of the early Muslim saints." [২১]

এ বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য "An Advanced History of India" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি - "... the proselytising zeal of Islam strengthened conservatism in the orthodox circles of the Hindus, who with a view to fortifying their position against the spread of the Islamic faith, increased the stringency of the caste rules and formulated a number of rules in the smriti works. The most famous writers of this class were Madhava of Vijayanagar, whose commentary on a Parasara smriti work entitled Kalanirnaya was written between A.D. 1335-1360. Visveśvara, author of Madanaparijata, a smriti work written for king Madanapala (A.D. 1360-1370);

the famous commentator of Manu, Kulluka, a Bengali author belonging to Beneras school by domicile; and Raghunandana of Bengal, a contemporary of Chaitanya."[২২] - ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা এই সময়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হিন্দু সমাজে ফিরে আসার পথ খুলে না রেখে আত্মরক্ষার তাগিদে শম্বুক বৃত্তির অনুসারী হওয়ায় সমাজের গন্ডীকে আরও কঠোর আরও সংকীর্ণ করে তুলেছিলেন অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে।

পর্তুগীজ বণিক বারবোসার বিবরণে (১৫১৪ খ্রীঃ) হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উল্লেখ আছে।[২৩] মুসলমান রাজসরকারের উচ্চপদ লাভের আশায় অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে, বারবোসা তারই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয় গ্রহণ করলেই জাতিভ্রষ্ট হতে হতো। এমন কি নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ আঘ্রাণ করলেও জাতিচ্যুতি ঘটতো। হিন্দু সমাজের এই সংকীর্ণ মনোভাবও মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।[২৪]

ড: সুকুমার সেন লিখেছেন, "নবদ্বীপ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল বলিয়াই সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দে চাটিগাঁ ও সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতে ধনী ও সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিদের অনেকে উঠিয়া আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহার পিছনে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় থাকাও সম্ভব।"[২৫]

মুসলমান শাসনকালে হিন্দুসমাজ ক্রমশ: সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। সেন রাজাদের আমল থেকেই হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ দৃঢ়তর - শ্রমজীবী শ্রেণী অবজ্ঞাত। এই

যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য : "সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণেরাও ভূমি সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন, সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত। ... স্পষ্টই দেখিতেছি, সেন-যুগে রাষ্ট্রের সমাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।[২৬] এই সংকীর্ণদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণতর হয়ে আসতে থাকে। সুতরাং জাতিভেদের গন্ডীও দৃঢ়তর হতে থাকে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "স্বাধীন সুলতানদের আমলে ব্রাহ্মণ শাসিত উচ্চবর্ণের সমাজ ধীরে ধীরে আপনাকে গুছাইয়া লইতে ছিল। বৃহস্পতি স্মৃতি রত্নহার রচনা করিয়া-ছিলেন। আরও অনেকে স্মৃতি লিখলেন। জাতিভেদের গন্ডীর প্রসার বাড়াইয়া শূদ্রের মধ্যে 'সৎ' 'অসৎ' বিচারপূর্বক বিবিধ কম্পার্টমেন্টে ভাগ করিয়া হিন্দুর ছত্রিশ জাতি মানিয়া লওয়া হইল। সব জাতির পক্ষেই সংস্কার ব্যবস্থা করা হইল।[২৭]

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সহিত গৌড়ে ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়া ছিল এবং ব্রাহ্মণ প্রচলিত কঠোর সমাজ শাসনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ হিন্দু সমাজে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। নব প্রচলিত ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্বে পূর্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতি-ভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহন করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল।[২৮]

ব্রাহ্মণ পন্ডিত অধ্যুষিত এককালের রাজধানী নবদ্বীপেও কিছু বৌদ্ধের বাস ছিল। চূড়ামণি দাসকৃত গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে নবদ্বীপে পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধদের বসবাসের উল্লেখ পাই -

বৌদ্ধ তার্কিক মীমাংসিক বৈদান্তিক।
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক॥ [২১]

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত পাষন্ডীগণের বৌদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। বিলীয়মান বৌদ্ধ মহাযান বজ্রযান কালচক্রযান মতবাদের প্রভাব বিকৃত তান্ত্রিক আচার-মদ্যাশক্তি-সহজিয়া প্রভাবান্বিত ধর্মচর্যার নামে ব্যভিচারের ব্যাপকতা - ধর্মের নামে নিষ্প্রাণ লৌকিক আচার সর্বস্বতা - লৌকিক দেবদেবীর পূজা - লৌকিক দেবদেবীর মঙ্গল গান - আমোদ প্রমোদ স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত হিন্দু সমাজের দৃঢ়বন্ধনকে ক্রমাগত আঘাত হেনে দুর্বল করে ফেলছিল। অপরদিকে প্রাচীন বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি পৌরাণিক পূজাপার্বণও উচ্চবর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পন্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালার ধর্মার্চনা সম্পর্কে ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "The decline of faith in the vedic sacrifices and rituals, and the substitution in its place of sectarian religious and numerous ceremonies and festivals connected therewith, continued during the middle age. Buddhism as a religious sect practically vanished, though some scholars trace its influence, or even survival in the worship of Dharma Thakur, referred to in the Śunya Purana prevelent

among The lower clases of people. Jainism maintained a precarious existence in Bengal. Saivism. Saktism and Vaishnavism with numerous sub-sects became very popular, though less popular sects of old like Saura Gāṇapatya, Pāśupata, Pancharātra, Kāpālika etc. were not altogether unknown. The Tantrik religion also flourished very much and its mantras, mudrās and mandalas acquired wide popularity."৩০

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালার সমাজের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। তিনি লিখেছেন। -

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥ ৩১

ভক্তি-ধর্মের প্রসার সেকালে ছিল না। ছিল আমোদ প্রমোদ আর ধর্মের নামে তামসিকতা ও দেবপূজার নামে অনাচার। তাই বৃন্দাবন আরও বলেছেন,

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥ [৩২]

বৃন্দাবন আর একস্থানে লিখেছেন -

সকল নদীয়া মত্ত ধনপুত্ররসে॥
শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস।[৩৩]

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থার উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে বৃন্দাবনের বর্ণনায় :

ধর্মকর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত॥ [৩৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন -

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করে জাগরণ
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।।[৩৫]

মদ্যমাংসে দানব পূজা যক্ষপূজা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি ভূত প্রেত ডাকিনী শাকিনীতে বিশ্বাসও ছিল। তাই ডাকিনী-শাকিনীর ভয়ে শচী দেবী পুত্রের নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।[৩৬]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কলিযুগে পৃথিবীর দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বসুন্ধরা বলছেন -

কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্নভোজন।
সর্বলোক হইল শিশ্নোদর পরায়ন।।
ব্রত উপবাস নাস্তি কার শক্তি।
গঙ্গা তুলসীর সেবা নাস্তি বিষ্ণুভক্তি।।
বাপ মা ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী।
পরদারে রত হইল লঙ্ঘে নিজ সতী।
স্নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাস্তি মনে।।
শূদ্র স্ত্রীসঙ্গম করে শূদ্র ভক্ষ্যে রত।
মৎস্য মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত।[৩৭]

চোর দস্যুর উপদ্রব যেমন ছিল, তেমনি দস্যুরা মদ্যমাংস দিয়ে চণ্ডীর পূজাও করতো।

নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমার উল্লেখ করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন -

নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥[৩৮]

অধ্যাপকের সংখ্যা উল্লেখের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি আছে অবশ্যই। তবে নবদ্বীপের বিদ্বৎসমাজ সেকালে যে দিগন্তব্যাপী যশের অধিকারী হয়েছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিদ্যা ছিল শুষ্ক জ্ঞানচর্চা-নব্যন্যায়ের কূট তর্কের জটিলতার দ্বারা আচ্ছন্ন। দেবভক্তি ঈশ্বরভক্তি তখন শূন্যে বিলীন। বৃন্দাবনের মতে ন্যায়ের তর্কে বালকেরাও দক্ষ ছিল।

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষ করে॥[৩৯]

মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় গৃহীভক্ত শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাঁর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ সংখ্যাতে নবদ্বীপের পন্ডিত মন্ডলীর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন -

অভ্যাসাদ্য উপাধি জাত্যনুমিতি - ব্যাপ্ত্যাদিশব্দা বলে -
জন্মারভ্য সুদূর-দূরভগবদার্তা প্রসঙ্গাসমী।
যে যত্রাধিক - কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥[৪০]

জন্মকাল হতে অভ্যাস বলে তার্কিকগণ, কেবল জাতি, অনুমিতি, উপাধি, ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দ নিয়ে তর্কে কালাতিপাত করতেন। শুষ্ক তর্কের দ্বারা ভগবদ্ বস্তু কি তা জানা যায় না, এ সমস্ত পন্ডিতমন্ডলী তা না বুঝে ঘট-পটের বিচার নিয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন।

কিন্তু যে গুণে লৌকিক বিদ্যা শুষ্কজ্ঞানে মাত্র পর্যবসিত না হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে - সেই ভক্তিগুণ অধ্যাপকদের ছিল না। তাই আক্ষেপ করে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তাঁরা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে।। [৪১]

সেকালের সমাজ ও অধ্যাপক-পন্ডিতদের ভক্তিহীনতা সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস আরও লিখেছেন -

ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল বিচার।।
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম কেহো না জানয়।।
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কিছুই না মানে।।
যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবতগীতা।
সে হো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা।। [৪২]

যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন উপহাসের পাত্র "সকল পাষন্ডী মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।" [৪৩]

সুতরাং চৈতন্যভক্ত বৃন্দাবন স্বাভাবিকভাবেই আক্ষেপ করেছেন -

বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার।। [৪৪]

নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু লোকমুখে গৌড়দেশের যে সংবাদ পেয়েছিলেন সেখানেও ভক্তিবিহীন জ্ঞানচর্চার বিবরণ পাই।

কেহো কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম।
সজ্জন দুর্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ।
কেহ কহে ভক্তিছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি।
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি।। [৪৫]

নৈতিক অধোগতিও দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সমাজকে গ্রাস করেছিল, অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল বাঙালী সমাজ। তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপকতার ছদ্মবেশে নরনারীর ব্যভিচার বিষাক্ত দুষ্টক্ষতের মত সমাজ দেহে প্রসারিত হয়েছিল। সহজিয়া সাধনার ছদ্মবেশে ধর্মের নামে নরনারীর ইন্দ্রিয়চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। হিন্দু রাজারাও এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিম্বদন্তী এই যে সম্রাট বল্লালসেনের রক্ষিতা পদ্মিনী নাম্নী সুন্দরী চন্ডালকন্যা প্রাণাধিকা মহিষীরও অধিক মর্যাদা ভোগ করতো এবং রাজা চন্ডালী-পরিবেষ্টিত খাদ্য সভাসদবর্গকে ভোজন করতে বাধ্য করতেন। [৪৬]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের বক্তব্য : "চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল সমগ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। 'আদি' নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। এমনও ভাবা হয়েছে যে, চৈতন্য যে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তার অনেক অংশই এখন গঙ্গা নদীর গর্ভে রয়েছে। ... বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। নিম্নজাতির মানুষরা ছিলেন প্রাথমিক উৎপাদক। ... চৈতন্যের আবির্ভাবকালে গ্রামে নগরে মানুষদের মধ্যে কোনও সামাজিক সংহতি প্রকৃত অর্থে ছিল না। কেবল হাটে বাজারেই উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের লেনদেন-এর সম্পর্ক ছিল। তাদের সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড একই রকমের ছিল না।

ধনীদের অর্থ প্রধানত ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে খরচ করা হত। বৃন্দাবন দাস এক ধরণের সঙকীর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন। ... "বিবাহাদি কর্মে আনন্দ" অবশ্যই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতা ছাড়া লাভ করা যেত না। তাই পুরোহিতদের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায়। ... বঙ্গে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তুর্কী-আফগানদের আগমন হয়েছিল। তার ফলে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ইসলামের প্রচার ও প্রসার। ফলত সমাজে, জীবনাচরণে এবং দৃষ্টি ভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই পরিবর্তনের স্বরূপ অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়।

অধুনা বিভিন্ন তথ্যের আলোকে দেখানো হয়েছে যে, ভারতে তথা বঙ্গে সুলতানরা পূর্বকাল থেকে প্রচলিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে, কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে, কৃষির ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেননি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা dominant continuity রূপে বিবেচিত হয়েছে, সুলতানি আমলে তা সর্বাংশে ভেঙ্গে পড়েনি। তখন বঙ্গের বহির্বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়। নবদ্বীপের উপরে যে রমার অথবা লক্ষ্মীর "দৃষ্টি" পড়েছিল, তা বৃন্দাবনদাস সানন্দে আমাদের জানিয়েছেন।[৪৭]

সত্য কথা বলতে কি সে সময় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক সকল দিক থেকেই বাঙালী হিন্দু ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। যুগের এই সংকটজনক মুহূর্তে আবির্ভাব যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের।

নবদ্বীপে বৈষ্ণব পরিমণ্ডল :

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলায় প্রেমভক্তির অন্য একটি সংকীর্ণ নির্ঝরও সকলের অগোচরে ধীরগতিতে প্রবাহিত ছিল। এই নির্ঝরের জন্ম শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী থেকে। শ্রীচৈতন্য এঁকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। যে সব অনুভাব, দৈহিক বিকার ও চেষ্টা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে 'সাত্ত্বিক ভাব') অন্তরস্থ প্রেমভক্তির অনুমাপক, সেগুলি মাধবেন্দ্রপুরীর মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল।

পুরী সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরী এবং পরমানন্দপুরী এ দুই ভক্তিভাবুক তাঁর শিষ্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি কেশবভারতী, অদ্বৈত আচার্য ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রেমভক্তি বিষয়ে মন্ত্রদীক্ষা দেন। নিত্যানন্দের তিনি দীক্ষাগুরু না হলেও তাঁকে প্রেমভক্তি বিষয়ে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিলেন।

বীরভূমের কেন্দুবিল্ব-নান্নুর থেকে অজয়ের তীর ধরে কাটোয়া-নবদ্বীপ -শান্তিপুর পর্যন্ত একটি বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল - খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ যদিও অবিশ্বাসী পাষণ্ডী ও বিধর্মী শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত হতেন, তবুও তাঁদের প্রভাব ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন অদ্বৈত আচার্য। বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে সমবেত হচ্ছিলেন।

কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটি গ্রামে।
কেহ রাঢ় উড্র দেশে শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
সব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়দানের জন্ম অন্যস্থানে॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥
ভবরোগনাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ।
বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ [৪৮]

বৃন্দাবন দাস পুনর্বার বলেছেন -

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি যবে হইল মিলন॥ [৪৯]

অদ্বৈত আচার্যের জন্ম ও বংশপরিচয় সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তী প্রদত্ত বিবরণ :

অদ্বৈতের পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্বে শান্তিপুরে গতায়াত॥
বঙ্গ দেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥
তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য এ খ্যাতি তাঁর হয়॥
*　　*　　*　　*
নাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা তেঁহো অদ্বৈত জননী॥
*　　*　　*　　*
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥ [৫০]

বিবাহের পরে অদ্বৈত শান্তিপুরে আগমন করেন। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাসস্থান ছিল।

ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈত রায়।
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায়॥
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি।
কৃষ্ণ রসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি॥
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
কৃষ্ণ বিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায়॥ [৫১]

নিত্যানন্দ দাসের মতে শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে কুবের মিশ্র এবং নাভাদেবী বাস করতেন। নাভাদেবীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহন করে। কন্যাটি জন্মের পরেই মারা যায়। ছয় পুত্রের নাম শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস ও কীর্তিচন্দ্র। ছয় জনেই তীর্থ পর্যটনে গমন করেছিলেন। তন্মধ্যে চারজন তীর্থ পর্যটনকালেই লোকান্তরিত হন। অপর দুজন ফিরে আসেন কুবের নবগ্রাম ত্যাগ করার পর। পুত্রশোকে কাতর হয়ে কুবের ও নাভাদেবী নবগ্রাম ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে বসবাস করেন।

পুত্রশোকে নাভাদেবী কুবের মহামতি।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিলা বসতি॥ [৫২]

শান্তিপুরেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাকান্ত, পরে নাম হয় অদ্বৈত আচার্য। স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ সমাপনের পরে পিতৃবিয়োগের পর বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে ফিরে এসে মদন গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করলে অদ্বৈত তাঁর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করেন -

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানে।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য অদ্বৈত সর্বলোকে মানে॥ [৫৩]

ভক্তি রত্নাকর অপর একস্থানে বলেছেন যে, কুবের ও নাভাদেবী গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে॥ [৫৪]

তারপর নাভাদেবী গর্ভবতী হলে কুবের নবগ্রামে ফিরে আসেন এবং অদ্বৈতের জন্মের কিছুকাল পরে তিনি বন্ধুবর্গের সঙ্গে শান্তিপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন।

অদ্বৈত প্রকাশের বিবরণ অনুসারে কুবেরের অনেকগুলি পুত্র সন্তান মারা যাওয়ার পরে তিনি শান্তিপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। পরে দিব্যসিংহ নরপতির রাজত্বকালে কুবের লাউড়ের নবগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন ভার্য্যার সঙ্গে। সেখানেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। অদ্বৈত দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে এসেছিলেন ষড়্‌দর্শন অধ্যয়ন করতে।

দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম শান্তিপুরে গেলা।
ষড়্‌দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা॥ [৫৫]

কিছুকাল পরে সস্ত্রীক কুবের শান্তিপুরে এসে পুত্রের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। অদ্বৈত আচার্যের জন্ম শ্রীহট্টেই হোক আর শান্তিপুরেই হোক, তিনি শান্তিপুরেরই অধিবাসী ছিলেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তৎকালীন নদীয়ায় বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহন করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

তবে লোক শিক্ষাইতে প্রভু সযতনে।
কৃষ্ণমন্ত্ররাজ লৈল প্রভু পুরীরাজস্থানে।। ৫৬

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ পুন্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন -

পুন্ডরীক বিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয়।।
সর্বমতে জ্যেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে।
চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে।।
মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিতি হয়।
নবদ্বীপে আছে তাঁর অপূর্ব আলয়।। ৫৭

প্রেমবিলাসের মতে পুন্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ - চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পুন্ডরীক ঘোর বিষয়ীর মত রাজসিক জীবন যাপন করতেন। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাড়ী ছিল। এখানে তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন।

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার।।
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম।
পুন্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম।।
*　　*　　*　　*
নবদ্বীপে তার এক আছয়ে আবাস।
মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসি করে বাস।।
*　　*　　*　　*
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহ্যে সদা বিষয়ীর ব্যবহার কয়।।

*　　*　　*　　*

অতি গাঢ় কৃষ্ণভক্তি আছয়ে অন্তরে।
বিরক্ত বৈষ্ণব বোলি কেহ চিনিতে না পারে।। ৫৮

চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রাম নিবাসী পুণ্ডরীকের সহপাঠী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য মাধব মিশ্র বা মাধবাচার্যও নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে তাঁহার আলয়।।
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব ইহোঁ কুলাংশে উত্তম।।

*　　*　　*　　*

নবদ্বীপে আসি তিঁহো করিয়া আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।। ৫৯

শ্রীবাস পণ্ডিতের আদি বাড়ী শ্রীহট্ট - শ্রীবাসের পিতা জলধর পণ্ডিত শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ এসেছিলেন। শ্রীবাসের চার ভাই নবদ্বীপে ও কুমারহট্টে থাকতেন।

শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক।।
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল বিদ্বান।
রূপে গুণে শীলে ধর্মে অতিগুণবান।।
সর্বজ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয়।।
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত।।

শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণভক্ত অতিশয়॥
কুমারহট্টে বাস নবদ্বীপে আর।
নবদ্বীপে কুমারহট্টে গতায়াত সভার॥
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি।
কখন কখন কুমারহট্টে করে অবস্থিতি॥ [৬০]

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার অন্য দুই সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত নবদ্বীপে এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে।

চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
দুইভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর প্রিয় দাস॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়।
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্বদায়॥ [৬১]

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃপঞ্চকের মত প্রসিদ্ধ বৈদ্য চিকিৎসক এবং শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ভক্ত মুরারি গুপ্ত, শ্রীচৈতন্যের মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বাস করেছিলেন।

শ্রীবাস পন্ডিত আর শ্রীরাম পন্ডিত।
চন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার। [৬২]

চন্দ্রশেখর আচার্য নীলাম্বর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা সর্বজয়াকে বিয়ে করে সস্ত্রীক নবদ্বীপে এসে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর কাছে বাস করেছিলেন। কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেনের পিতা শিবানন্দ সেন শ্রীহট্ট জেলার চৌয়াল্লিশ পরগণার আদিপাশা গ্রাম থেকে এসে কুমার হট্টে বসবাস করেছিলেন।

গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙালেরাই নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে নবদ্বীপে প্রাক্ চৈতন্য বৈষ্ণব আবেষ্টনটি গড়িয়া তুলিয়া ছিল - পুরিপুষ্ট করিয়াছিল। [৬৩]

নানাস্থান থেকে আগত বৈষ্ণবগণের যে সম্মেলন ঘটেছিল নবদ্বীপে তার নেতৃস্থানীয় ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণবগণ সংখ্যালঘু এবং ও উৎপীড়িত হলেও কৃষ্ণনাম কীর্তন ইত্যাদিতে বিরত ছিলেন না। শ্রীবাসাদি চারিভ্রাতা নিজগৃহে কৃষ্ণনাম গান করতেন -

সর্বকাল চারিভাই গায়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গা স্নান॥ [৬৪]

শ্রীবাসের কীর্তনগানে স্থানীয় ব্যক্তিরা যবন ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীবাসকে শাস্তি দেবার পরামর্শ করছে শুনে অদ্বৈত আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মর্তে অবতীর্ণ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন -[৬৫]

অদ্বৈত সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর বলেছেন -

কৃষ্ণ বিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায়॥
কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে।
হইলা প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈত হুঙকারে॥[৬৬]

মাধবেন্দ্র শিষ্য আচার্য অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সহ যখন নিপীড়ন ভীত হয়ে গোপনে স্বগৃহে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন আর পরিত্রাতার আবির্ভাবের জন্য তপস্যা করছিলেন সেই সময়ে যবন হরিদাস এসে অদ্বৈতের সহিত সম্মিলিত হলেন। জন্মভূমি বূঢ়ন গ্রাম থেকে হরিদাস এসে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে বসবাস করতে থাকেন।

বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ॥
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥ [৬৭]

হরিদাস শান্তিপুরে ফুলিয়ায় গঙ্গাস্নান করতেন আর হরিনাম করতেন -

গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্বস্থান॥ [৬৮]

তিনি দৈনিক তিন লক্ষ নাম জপ করতেন -

হরিদাস ঠাকুর শাখায় অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥[৬৯]

নিত্যানন্দ দাসের বিবরণে হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা গ্রহন করে দৈনিক তিন লক্ষ নামজপে দিন অতিবাহিত করতেন।

কোন একদিন আইলা শ্রীশান্তিপুরে॥
অদ্বৈত প্রভুর পদে লইলা শরণ।
তাঁর ঠাঞি ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
অদ্বৈতের স্থানে তিঁহো হইয়া দীক্ষিত।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবা রাতি॥
লক্ষ হরিনাম মনে লক্ষ কানে শুনে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সঙ্কীর্তনে॥ ৭০

দুই পরম বিষ্ণুভক্তের মিলন বৈষ্ণব আন্দোলনের পক্ষে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হরিদাস শান্তিপুর ফুলিয়ায় আগমনে বৈষ্ণবদের নিঃসন্দেহে শক্তি বর্ধিত হয়েছেন। অদ্বৈত ও হরিদাস মিলে কৃষ্ণকথা রসে কাল কাটাতে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় হরিদাস ও অদ্বৈতের মিলনদৃশ্য :

আচার্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জনে তারে দিল।
ভগবদ্গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥
আচার্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥ ৭১

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস সমুদ্র তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥ ৭২

হরিদাস ও অদ্বৈত - এই দুই মহাসাধকের সাধনায় 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। দুই মহাসাধকের একই উদ্দেশ্য, - ভগবানের অবতার আশু প্রয়োজন।

জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥
দুইজনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥ [৭০]

দুই ভক্ত সাধক যখন আর্তত্রাতা ভগবানের আবির্ভাবের জন্য কঠোর সাধনায় রত সেই সময়ে শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অবিরত নাম সংকীর্তনে নবদ্বীপ-শান্তিপুরে বৈষ্ণবীয় পরিমন্ডল যে একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছিল এবং শক্তিসঞ্চয় করছিল তা অনুমান করা যায়।

সূত্রের উল্লেখ বা নির্দেশিকা :

১. Swami Budhananda, Ed. "The complete works of Swami Vivekananda", Mayavati Memorial Edition, Vol IV, Advaita Ashrama, Calcutta, Tenth Edition, 1972. p.337

২. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ সাল। পৃ.১১৬-১২২

সুকুমার সেন, 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা, ১ম আনন্দ সং ১৯৯১, পৃ.১৬১-৭১

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, 'চন্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমী, নয়াদিল্লী, ১ম সং, ১৯৭৫, পৃ.২০২

দ্রষ্টব্য : নিহাররঞ্জন রায় - 'বাঙালীর ইতিহাস'(আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ সাল, পৃ.৭৫-৭৭

Jadunath Sarkar, Ed. 'The History of Bengal : Muslim Period' Janaki Prakashan, Patna, 1977, p.100-105.

Debnarayan Acharyya, 'The Life and Times of Sri Krishna Chaitanya,' Firma KLM Pr. Ltd. Calcutta, 1st Edn., 1984.p.2-8

Jadunath Sarkar, Ed. 'The History of Bengal : Muslim Period' Janaki Prakashan, Patna, 1977, p.142-52

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত 'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য', রত্নাবলী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬, পৃ.৩৯

দ্রষ্টব্য : বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীচৈতন্যের উপাদান', ক.বি. ২য় সং ১৯৫৯ পৃ.৫০৭-২৭

৯. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা, ১ম আনন্দ সং ১৯৯১, পৃ.১১৪ - ১১৫

১০. তদেব পৃ.১০৫-১১০

১১. তদেব পৃ.৩৩৯-৩৪৪

১২. তদেব পৃ.১৪৮-৪৯

১৩. তদেব পৃ.১৬১

১৪. তদেব পৃ.২১২

১৫. তদেব পৃ.২১৩

১৬. তদেব পৃ.৪১৬

১৭. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৬, ১৪২-১৮১

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২য় সং, ১৯৬০, পৃ.২৪২

১৯. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খন্ড, পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৪র্থ সং, ১৯৬৩ পৃ.৮১

২০. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর', ভারতি বুক ষ্টল, কলিকাতা, ২য় সং - ১৯৬৬, পৃ.৫৪

২১. Kalika Ranjan Kanungo, 'Islam and its impact in India', General Printers & Publishers Pr. Ltd. Calcutta, 1st Edn, 1968, p.6

২২. R.C. Mazumder & Others, 'An Advanced History of India' Mac Millan & Co. Ltd., 1953 p.403.

২৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর', ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা, ২য় সং, ১৯৬৬, পৃ.৪৯৭
দ্রষ্টব্য - "এই অঞ্চলগুলির পৌত্তলিকরা প্রত্যহই অনেকে মূর(মুসলমান) হয়ে যায় শাসকদের অনুগ্রহ পাবার জন্য।"

২৪. Ramesh chandra Mazumdar, 'History of Medieval Bengal', G. Bhardwaj & Co. Calcutta, 1974, p.120.

২৫. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৪র্থ সং, ১৯৬৩, পৃ.২৫১

২৬. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব বুক এম্পোরিয়ম্, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৩৫৯, পৃ.৫১০

২৭. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃ.২৫০

২৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২য় খণ্ড, ১৯৭১ পৃ.২৪৭

২৯. দীনেশ সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত, 'গোবিন্দদাসের কড়চা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬ পৃ.১৪

৩০. Ramesh chandra Mazumdar, "History of Medieval Bengal' G. Bhardwaj & Co. Calcutta, 1974, p.195.

৩১. বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', (অতঃপর চৈ.ভা. অথবা তদেব) সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর প্রা.লি., কলিকাতা, ২য় সং - ১৩৬৯, পৃ.১৪

৩২. তদেব পৃ.১৫

৩৩. তদেব পৃ.৬৯

৩৪. তদেব পৃ.৪২৫-২৬

৩৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (অতঃপর চৈ.চ. অথবা তদেব), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, জেনারেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮ সাল, পৃ.১২৮

৫৪. ভ.র. পৃ.২০১

৫৫. ঈশান নাগর, 'অদ্বৈত প্রকাশ', সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৩ সাল, পৃ.৮

৫৬. তদেব পৃ.১৮

৫৭. ভ.র. পৃ.৫২৫

৫৮. প্রেমবিলাস পৃ.২৬০

৫৯. তদেব পৃ.২১৭

৬০. তদেব পৃ.২২০

৬১. তদেব পৃ.২১৭

৬২. চৈ.ভা. পৃ.১৩

৬৩. গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, 'বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ.১৩

৬৪. চৈ.ভা. পৃ.১৫

৬৫. তদেব পৃ.১৬

৬৬. ভ.র পৃ.৫২৫

৬৭. চৈ.ভা. পৃ.১০৬

৬৮. তদেব পৃ.১০৬

৬৯. চৈ.চ. পৃ.৯৬

৭০. প্রেমবিলাস - ২৩৩

৭১. চৈ.চ. পৃ.৪৩৯

৭২. চৈ.ভা. পৃ.১০৬

৭৩. চৈ.চ. পৃ.৪৩৯

৩৬. তদেব - পৃ.১১০

৩৭. জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল', বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ.৭

৩৮. চৈ.ভা. পৃ.১৪

৩৯. তদেব - পৃ.১৪

৪০. কবিকর্ণপুর, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্', মনীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া, ২য় সং, ১৩৭৮ সাল, পৃ.৪৯-৫০

৪১. চৈ.ভা. পৃ.৩০২

৪২. তদেব পৃ.৩০২

৪৩. চৈ.ভা. পৃ.১৬

৪৪. তদেব পৃ.১৬

৪৫. নিত্যানন্দ দাস ও যশোদালাল তালুকদার সম্পাদিত ও প্রকাশিত, 'প্রেমবিলাস', (অতঃপর প্রেমবিলাস), বাগবাজার পত্রিকা অফিস্, কলিকাতা, ১৩২০, পৃ.১

৪৬. Dinesh chandra Sen, 'Chaitanya and His age', Calcutta University, 1922, p.6.

৪৭. রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলিকাতা, ১ম সং - ১৯৯৬, পৃ.২৪-২৫

৪৮. চৈ.ভা. পৃ.১৩

৪৯. তদেব পৃ.১৪

৫০. নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তিরত্নাকর'(অতঃপর ভ.র.) ভাগবত মহারাজ সম্পাদিত, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৫২৩

৫১. তদেব - পৃ.৫২৪-২৫

৫২. প্রেমবিলাস পৃ.২২৮

৫৩. তদেব - পৃ.২৩২